সেভিল, ল্যুভ ও দ্যা ভিঞ্চির 'সালভেতর মান্দি'

দিলরুবা শাহানা

শুনলেই মন উদাস হয়। চেতন অবচেতনে আকাখঙা জাগে দেখার পৃথিবীর এমন সব শহর বন্দর নগরের একটি হচ্ছে ফ্রান্সের রাজধানী। প্যারিস। সংস্কৃতি ও শিল্পের নগরী প্যারিসে আকর্ষণীয় অনেক কিছুই রয়েছে। আইফেল টাওয়ার, নোটরড্যাম গির্জা থেকে আর্ট গ্যালারী ল্যুভ সবই দর্শনীয়। প্যারিস যেতে পারলে এই দর্শনীয় বস্তুগুলো দেখার ইচ্ছে সবারই থাকে। ল্যুভ মিউজিয়াম দেখে এসে কতজন কত ভাবে যে এই গ্যালারী দর্শনের বয়ান লিখেছেন বলার অপেক্ষা রাখে না। নানা দৃষ্টিকোণ লেখা সেসব বয়ান বা ভাষ্য। তা পড়ে পড়ে খুঁটিনাটি অনেক চিত্তাকর্ষক তথ্যই সমজদার পাঠকের জানা হয়েছে এবং ভবিৎষ্যতে হয়তো আরও অনেকের মাধ্যমে আরও জানা হবে।

ভাগ্যচক্রে নয় রীতিমত পরিকল্পনার ফাঁদে পা দিয়ে একবার প্যারিসে যাওয়া হয়েছিল। পুত্রধন বউমাসহ কর্মসূত্রে ইউরোপে গেছে । থাকবে ওরা কিছুদিন সেখানে। তারপরে কাজকর্ম শেষে আপন কুলায় ফিরবে একদিন এই তাদের পরিকল্পনা। হীরামানিক্য আনতে নয় এমন জায়গায় গিয়ে ইউরোপ মহাদেশের যতটা সম্ভব ঘুরে দেখার সুযোগ যেন হেলায় না হারায় এই কথাটা মনে করিয়ে দিয়েছি বার বার। নিজের ছাত্রজীবনে যৎসামান্য রেস্ত সম্বল করে যতটুকু ঘুরা সম্ভব ঘুরেছি। সব দেখা হয়নি, সাধ হয়েছে সাধ্যে কুলায়নি। ওরা রোজগেরে মানুষ ছাত্র তো নয়। খরচ করার মত সাধ্য আছে ওদের। এখন শুধু দরকার সময় আর চারপাশ ঘুরে দেখার ইচ্ছা। ওদের সাথে প্যারিস, মাদ্রিদ, বার্সেলোনা, প্রাগ, বুদাপেষ্ট, সুইসজ্যারল্যান্ডের বরফ ঢাকা পর্বতমালা ও ইতালীর লেক কোমোর মতো সব জায়গায় স্বশরীরে না গিয়েও দেখা ও মজার মজার সব কাহিনীতে অংশ নিলাম প্রযুক্তির বদৌলতে বা কল্যানে। তবে একদিন আমাকে চমকে দিয়ে বাছাধন ফোনে বললো

-মামনি এই মাত্র আমরা নিকোলাস টেসলার এয়ারপোর্টে নেমেছি; বলতো এটা কোথায়?

-নিকোলাস টেসলার একজন বিজ্ঞানী এটুকুই জানি, তার নামে এয়ারপোর্ট আছে তাতো জানতাম না

-এটা হচ্ছে সেরভিয়ার বেলগ্রেডে। তুমিতো বহুদিন আগে সমাজতান্ত্রিক ইয়োগোস্লাভিয়ার শহর জাগ্রেব এসেছিলে তাইনা?

-তাইতো গিয়েছিলাম, তবে এ্যারোপ্লেনে নয় ট্রেনে।

-ওই দেশ ভেঙ্গে এখন অনেক গুলো রাষ্ট্র হয়েছে তারই একটা সেরভিয়া। টেসলার মিউজিয়াম ঘুরে এসে তোমাকে ফোন দেব এখন রাখি।

ফোনটা রেখে একটু ভাবলাম। সে বার ইতালীর লেক কোমো থেকে ভিডিও কলে দেখিয়েছিল চাইনিজ জ্যাসমিন বা আমাদের বেলী ফুলের সম্ভার। ওরা যখন ওইখানে তখন লেক কোমো মো মো করছিল বেলী ফুলের সুবাসে। না গিয়েও হাজার মাইল দূরে বসে সে সুবাস যেন এসে লাগলো আমার প্রাণে, অবশ্যই নাকে নয় । দেখেছি আর ভেবেছি শিল্পী মানুষ দীপিকা পাডুকোন কেন লেক কোমোকে নিজের বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য বেছে নিয়েছিল। অবশ্যই অতিথিদের বেলী ফুলের সুবাসে মাতিয়ে দিতে।

বিজ্ঞানী টেসলার বৈদ্যুতিক আলোর কয়েল আবিষ্কর্তা বলে জানি, সেরভিয়া থেকে আলোর পরশ চোখে লাগতে পারে তবে গন্ধ নয়।

জানা হল টেসলার মিউজিয়ামের অন্ধকার ঘরে দর্শনার্থীরা হ্যালোজেন দন্ড হাতে সারি দিয়ে ঢোকা মাত্র কোথাও যেন অন্ধকার চিড়ে উঁচু স্তম্বের উপর আলোর শিখা ঝলসে উঠলো সাথে সাথে সবার হাতে হ্যালোজেন লাইট জ্বলে উঠলো। বিজ্ঞানী টেসলারের এমনি মজার ক্ষমতা।

টেসলার মিউজিয়াম ঘুরে এসে ছেলে বললো

-টেসলার সম্পর্কে অনেক মজার কথা বলার আছে। এতো গল্প তোমাকে ফোনে শুনাতে পারবো না। আচ্ছা মা ইউরোপে কোন দেশটা এখনো তোমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে বলতো?

-বেশী কোথাও নয় তবে গ্রানাডা একবার যেতে পারলে হতো

-ইউরোপে ইসলামের কীর্তি দেখার ইচ্ছা তাই না? তবে এই ট্যুর প্লান খুব গুছিয়ে তৈরী করতে হবে বুঝলে।

মনে মনে নিজেকে বললাম ইসলামের কীর্তিতো আছেই আরও আছে ফেদরিকো গার্সিয়া লোরকা, যিনি গ্রানাডার সন্তান, যাকে এই গ্রানাডা শহর থেকেই ১৯৩৮এ স্পেনের স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ত ফ্রাঙ্কো কোন চিহ্ন না রেখে লোপাট করে দিয়েছিল।

তো এভাবেই প্রায় স্বপ্নের ঘোরে এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশের দেশ ভ্রমণের ফাঁদে পা দেওয়া হল।

সময় সুযোগ মিলিয়ে দুবাই হয়ে মাদ্রিদ পৌঁছানো গেল। যাত্রা পথে দুবাইতে কিছুটা সময়ের জন্য যাত্রা বিরতি ছিল। গোসল-ঘুম-বিশ্রামের পর তরতাজা হয়ে আর এক জায়গায় রওয়ানা। সে হচ্ছে মাদ্রিদে। স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ শহরে একদিন কাটিয়ে এমন এক জায়গায় পৌঁছাব যার কথা ভাবিই নি। জায়গাটা হচ্ছে স্পেনের আন্দালুসিয়া অঞ্চলের রাজধানী সেভিল, যাকে স্প্যানিস ভাষায় সেভেইয়া বলে । এই জায়গা থেকে গ্রানাডা বাসে বা ট্রেনে ঘন্টা তিনেকের রাস্তা। আবার সেই সেভিল বা সেভেইয়া থেকে ফ্র্যান্সের রাজধানী প্যারিসে বিমানে যেতে লাগে একঘন্টা আর ট্রেনে লাগবে তিন ঘন্টা। প্যারিসে তখন সরকারের পেনসন নীতির প্রতিবাদে হট্টগোল, হৈহৈ, রৈরৈ চলছে। যাওয়া হবে কি না তা পড়লো প্রশ্নের মুখে। আমার ইচ্ছা ও আকর্ষণ ট্রেনে যাওয়া। তা হলে পথের দৃশ্যাবলী দেখার অপূর্ব সুযোগ থাকে। পরিস্থিতি বিবেচনায় মনে হল তা হবার নয়। ট্রেনের টিকেট বাতিলই করতে হল কারন প্যারিসে ট্রান্সপোর্ট ধর্মঘট তুঙ্গে তখন।

সময় ও সুযোগ ছিল বলে পরবর্তী যাত্রা নিয়ে ভাবার জন্য গ্রানাডা ঘুরে এসে আবার সেভিলে আরও দু'দিন থাকা হল। গ্রানাডার গল্প আলাদা করে শুনানোর ইচ্ছা । তাই অপূর্ব শহর সেভিলের কথা আজ বলি। এই শহর কমলা লেবুর শহর। পত্রমোচী বৃক্ষ নয় এই কমলা গাছ। পাতা ঝরায় না এরা। পাতায় পাতায় পূর্ণ কমলা লেবুর গাছ সারা বছর সিভিলকে উষ্ণতা থেকে বাঁচিয়ে শীতল করে রাখে। সেভিলের পথে পথে দু'পাশে কমলা লেবুর গাছের সারি। গাছের ছায়ায় ছায়ায় ঢাকা রাস্তা । এর ফুল যখন ফোটে কমলাফুলের গন্ধে সেভিল শহর মাতোয়ারা হয়। ফলের মৌসুমের পড়ন্ত বেলায় এসেও দেখলাম অপূর্ব উজ্জল রঙ্গের ফলের সম্ভার। রাস্তার দু'পাশের গাছে গাছে থোকা থোকা কমলা লেবু ধরে আছে। দুঃখের কথা হল এই কমলালেবু গাছ থেকে পেড়ে তখনই খাওয়া যায় না, কারন এর স্বাদ এতো তেতো। স্থানীয় লোকজন জানালো এই কমলা লেবু ইংল্যান্ডে রফতানী করা হয় আর ইংরেজরা তা দিয়ে মার্মালেড তৈরী করে। স্পেনের সেভিলের তেতো কমলা দিয়ে ইংরেজদের বানানো সুস্বাদু সুইট অরেঞ্জ মার্মালেড পৃথিবীর যে কোন শহরে বসে কিনে খাওয়া যায়। বোঝার উপায় নেই যে গাছ থেকে পেড়ে এই ফল মুখে দেওয়ার জো নেই।

রোমানদের পতনের পর ইসলামের আধিপত্যের সময়ে আল আন্দালুসের এই শহরের সাথে সাথে মুসলমান শাসকদের নির্মিত আল কাজার প্রসাদ আজও তার সৌন্দর্য আর সৌকর্যের পশরা নিয়ে দর্শকের নয়ন নন্দিত করে। এই জায়গাতে রোমানদের সময়ে যে একটা স্থাপনা ছিল তাতেই মুসলমানরা আল কাসর অর্থাৎ প্যালেস বা রাজপ্রাসাদ নির্মান করে। ইতিহাস ঘাটলে জানা যায় ইউরোপে যে সময়কে মধ্যযুগ বলে অভিহিত করা হয়েছে, সে সময়কেই হাজার বছরের অন্ধকার সময়ও বলা হয়। ইউরোপের অন্ধকার সময়ে মুসলমান শাসন আইবেরিয়ান পেনিনসুলাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শিক্ষা সংস্কৃতির বিস্তার করে। অংক, শল্যচিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যায় মুসলমানদের অর্জন সে সময়ে স্পেনের কর্ডোভা শহর ও সেভিলের মাধ্যমে ইউরোপীয়দের কাছে পৌছায়। পরবর্তী খ্রীষ্টান রাজন্যবর্গ মুসলমানদের অসামান্য সুন্দর সব নির্মান ধ্বংস করেনি বরং নিজস্ব পছন্দনীয় না না প্রলেপ ও পরিবর্তনের মাধ্যমে সযত্নে রক্ষা করেছে, আরও উৎকর্ষ সাধন করছে। পৃথিবীর এই অঞ্চলে দ্রষ্টব্য হচ্ছে ইসলাম ধর্মীয় নকশামন্ডিত তৈরী শৈল্পিক নির্মান ও ইউরোপীয় রেনেসার নানা উদাহরণ। এই সেই প্রাসাদ মুসলমান শাসনের অবসানের পরে পরেই স্পেনের ক্যাস্টিলিয়ান রানী ১ম ইসাবেলা বা ইজাবেলা ও রাজা ফার্ডিনান্ডের বাসর রাত হয় যেখানে। এই প্রাসাদ থেকেই রানী ইসাবেলার সনদ ও পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে ইতালীয় বংশোদ্ভুত ক্রিস্টোফার কলম্বাস দেশ আবিষ্কারের নেশায় সমুদ্রে তরণী ভাসান। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের অভিযান এভাবেই সেভিলের আল কাজার প্রাসাদের এক দরবার কক্ষ থেকে অনুমোদন ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে শুরু হয়েছিল। সে দরবার কক্ষে কলম্বাসের জাহাজের ছোট একটি রেপ্লিকা আজও সংরক্ষিত যা স্প্যানীয়দের গৌরব আর সৌর্যকে স্মরণ করায়।

স্পেনের প্রকৃতি কিছুটা রুক্ষ ও শুস্ক। সে দেশের পাথুরে ও রুখাশুখা আন্দালুসিয়া থেকে সমুদ্র পথে যাত্রা করে কলম্বাস আমেরিকা খুঁজে পেল। যার ফলশ্রুতিতে আমেরিকার বিরাট অঞ্চলে স্প্যানীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। পরদেশ করায়ত্তে এনে উপনিবেশ স্থাপন যারা করে তা তাদের জন্য শক্তি, ক্ষমতা ও গৌরবের প্রদর্শন আর যাদের বা যে জনগোষ্ঠীকে এই শৃংখলে বাঁধা হয় তা তাদের কাছে ক্ষমতাশীল ঔপনিবেশিকদের দূর্বৃত্তপনা ছাড়া কিছু নয়। তর্কাতীত বিষয়। দখলদার ঔপনিবেশিকরা কখনোই যত্নে ও মমতায় উপনিবেশের মানুষের মঙ্গল সাধন করেনি, বরং নির্মম হাতে নিষ্ঠুর পন্থায় লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে যত সম্পদ।

সাম্প্রতিক একটি সূত্রে উল্লেখিত যে ভারতীয় উপনিবেশ যখন ইংরেজরা করায়ত্ত করে তখন 'India represented one quarter of the world economy when Britain began to conquer it in 1757. And it was we British who impoverished it. So argues *Inglorious Empire*, a remarkable new book…savagely critical… it demolishes the argument that the British were benign imperialists'(Matt Ridley, The Time)

শশী থারুর *Inglorious Empire What the British Did to India* অতি সম্প্রতি ভারতে আকাদেমী পুরস্কার জয়ী একটি বই। যাতে লেখক দেখিয়েছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কলোনিয়াল শক্তি কিভাবে কনক-কাঞ্চন লুটেপুটে, ছিড়ে খামচে নিয়ে গেছে ভারতীয় উপনিবেশ থেকে। এই বইয়ের সমালোচক ম্যাট রেডলী টাইম পত্রিকায় লিখেছেন যে ব্রিটিশরা 'নির্দোষ সাম্রাজ্যবাদ' ছিল এমন যুক্তিকে গুড়িয়ে দিয়েছে শশী থারুর এই বই।

তবে যাহোক কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের শতবর্ষকে স্মরণীয় করতে আন্দালুসিয়ার রাজধানী সেভিলে লা স্পানার নির্মান সত্যিই চমৎকার। অপূর্ব এক স্থাপনা।

সেভিলের লা স্পানার চত্বর

দু'দিন বেশী থাকাতে আরও কিছুট সময় লা স্পানার পাথরের কারুকাজ করা উন্মুক্ত চত্বরে ঘোরা ও পর্সিলিনের টাইলস দিয়ে তৈরী নকশায় মুড়ানো স্পেনের বিভিন্ন শহরের প্রতিভু মনকাড়া চিত্রগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগ মিললো।

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের শতবর্ষ উপলক্ষে সেভিলে নির্মিত লা স্পানা

সেভিলের রয়াল আলকাজার প্রাসাদ ইসলাম, খ্রীষ্টিয় ও রেনেসার নকশার দৃষ্টিকাড়া বৈশিষ্টের সমাহার। আরেক কথায় আল কাজার হচ্ছে মুসলিম ও খ্রীষ্টিয় শৈল্পিক সৃজনশীলতার সমাবেশ।

আল কাজারের এক প্রবেশ দুয়ার

হাজার বছর আগে সাদা টাইলসে নীল কালিতে অপূর্ব আরবী ক্যালিগ্রাফিতে আল্লাহর নাম লিখে আল কাজার প্রাসাদের দেয়াল মুড়ানো হয়েছে দেখার মত। যা কিছু সুন্দর তা নষ্ট করা হয়নি, ভেঙ্গে ফেলা হয়নি, ধ্বংস করা হয়নি। শিল্পের মর্যাদায় আজও তা রক্ষিত। নয়তো এক হাজার বছর আগে সুন্দর ভাবে খুদাই করে আল্লাহর নাম যে কাঠে লিখিত হয়েছিল সে কাঠ কাঁচ দিয়ে মুড়িয়ে আজ পর্যন্ত রক্ষিত হতো না।

প্রাসাদের প্রতিটি অঙ্গন ও কোনে গাছপালা ও পানির নহর বইয়ে দিয়ে এমন স্বস্থি ও প্রশান্তির উদ্যান নির্মান করা হয়েছে যা ক্লান্তি মুছিয়ে দেয়। আল কাজার প্রাসাদের এমনি এক অঙ্গনে(বিশাল কত যে চত্বর রয়েছে যাতে বাগান ও পানির নহর রয়েছে অনেক)র কোনে মানুষের তৈরী এক স্থাপনা যা দেখতে আহামরি নয় তবে এর কর্মকান্ড অবাক করার মত। দেখা যাচ্ছে উঁচু পাথরের গা বেয়ে পানির ধারা নামছে আর বাতাস বয়ে যাওয়ার সময় তাতে বাজনা বেজে

উঠছে বা সাঙ্গিতীক ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ছে। এটা শাসকদের নির্মিত এক শিল্পকর্ম যা বহমান বাতাস ও ঝিরঝির করে নেমে আসা পানির মিলনে বেজে উঠে। মানুষ যে চিত্তের আনন্দের জন্য কি কৌশলে প্রকৃতির সম্ভারকে (এক্ষেত্রে বহমান পানি ও বাতাস) এমন শৈল্পিক ভাবে কাজে লাগিয়েছে তা দেখে বিস্ময় জাগে!

এসব শিল্পিত সৃজন দেখে মনে হল ক্ষমতাবানেরা শুধু যুদ্ধবিগ্রহ আর খুনোখুনিতে শক্তি ব্যয় না করে এমন সুন্দরের সৃষ্টিতে আরও বেশী করে মনোনিবেশ করলে, তা সব জনসাধারন্যে ছড়িয়ে দিলে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে মুগ্ধতায় আবিষ্ট করে রাখতে পারতো। এসব নির্মাণ হয়তো নতুন কিছু তৈরীরও প্রণোদনা দিয়ে যেতো লোকজনকে। এমন আনন্দদায়ক ও স্বস্তিদায়িনী সব সৃষ্টি মন ও চোখ ভরে দেখতে হলে হাঁটতে হবে আর সেভিল ছোট্ট ছিমছাম স্নীগ্ধ শহর বলে হাঁটাটা ক্লান্তিকর লাগেনি।

সেভিলের আল কাজার প্রাসাদের পিছনের দেয়ালের কাছেই আবাসিক হোটেলে ছিল আমাদের অবস্থান। তা হোটেল ছাড়তে হল ভোর পাঁচটায়। ট্যাক্সি ঠিক সময়ে আমাদের তুলতে আসলো। জানি না কোথায় যাচ্ছি, কোন বাহনে আমরা গন্তব্যে পৌঁছাব কোন ধারনা নাই। অতি ভোরে ঘুম ভেঙ্গে এক ঘোরের মাঝে রওয়ানা। ট্যাক্সি চালক স্যুট টাই পরা মাঝবয়সী স্প্যানীয় ভদ্রলোক। সে বেচারা বিদেশী যাত্রী পেয়ে তার ইংরেজী ভাষাটা ঝালাইয়ের জন্য উঠে পড়ে লাগলো।

'কবে সেভিলে এসেছো?' 'আল কাজার ট্যুর করেছো নিশ্চয়?' 'গ্রানাডা যাবে কি?' প্রতিটি প্রশ্নের পরেই জানতে চাইছে

'আচ্ছা আমার ইংরেজী বুঝতে পারছো তো?' 'ইংরেজীটা ঠিক আছে তো?' ইত্যাদি ইত্যাদি।

দুঃখ করে আরও বললো 'এখন অর্থনীতি এখানে ভাল না, জান পাঁচ বছর কাজ ছিল না আমার; এই কাজ পেয়েছি মাত্র পাঁচ ছয় মাস'। তারপর ভদ্রলোক আমাদের চমকে দিয়ে বলে উঠলো

'আচ্ছা বলতো তোমাদের কোথায় নামাবো ট্রেন স্টেশনে না এয়ারপোর্টে'?

ওর কথা শুনে আক্কেল গুড়ুম।

ইংরেজী বলায় মত্ত থাকায় ও বেচারা ভুলেই গেছে যাত্রীদের কোথায় নামাতে হবে।

এয়ারপোর্টে নামাতে হবে শুনেই স্যুটপরা ড্রাইভার ভদ্রলোকের প্রশ্ন

-কোথায় যাবে তোমরা?

ওর সাথে সাথে আমিও তখনি জানলাম আমরা প্যারিস যাচ্ছি এবং এ্যারোপ্লেনেই যাচ্ছি। মানে হল বাসে করে পথের দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে একদেশ থেকে আরেক দেশে যাওয়ার আনন্দটা হচ্ছে না।

ড্রাইভার লোকটির বকবকানি চলছেই

-যা অবস্থা প্যারিসে; গরীবের অবস্থা বড় কঠিন আর জিনিসপত্রের ভীষন দাম প্যারিসে। দেখবে সেভিলের চেয়ে কয়েক গুণ বেশী।

বেশী কথা বললেও লোকটি সঠিক কথাই বলেছে। প্যারিস আসলেও দামের শহর। ট্যাক্সি ভাড়া, হোটেল ভাড়া, টয়লেট ভাড়া, খাবারদাবার সবই দাম।

এয়ারপোর্টে নেমে দেখা গেল পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বন্ধ। ফরাসীরা ইংরেজ আর ইংরেজী দু'টোই খুব একটা পছন্দ করে না। এক সময়েতো ইংরেজী শুনলেই প্যারিসিয়ানরা নাক কুচকে সরে যেতো বলে শুনেছি। তবুও এক প্রাইভেট কারকে

ইংরেজীতেই নম্রভাবে বলে কয়ে রাজী করানো হল। প্যারিসের ন্যাশনাল একাদেমী অফ মিউজিক(*Academie Nationale De Musique*) হলের খুব কাছাকাছি নির্ধারিত ঠিকানায় পৌঁছাতে লাগলো প্রায় দুই আড়াই ঘন্টা। কারন পাবলিক ট্রান্সপোর্ট হরতালে। তাই সবাই নিজে নিজ গাড়ীতে রাস্তায় নেমে এমন জানজট তৈরী করেছে বলার মত না। এবার হোটেল নয় আমাদের আস্তানা হল এআরবিএনবি। তবে জায়গাটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ও সুবিধা জনক। দর্শনীয় অনেক কিছুই কাছাকাছি।

দুপুরের খাওয়ার জন্য কাছেই ছিমছাম সুন্দর কাফে পাওয়া গেল যার নাম ক্যাফে আর্টিজান। লাঞ্চ টাইম হওয়াতে কাফের বাইরে পর্যন্ত স্যুটেট বুটেট মানুষের লাইন।

লাইন ধরে ধীরে ধীরে আমরাও ক্যাশিয়ারের কাছে পৌঁছে খাবার অর্ডার দিলাম। ক্যাফের মতই খাবার দাবারও ভাল। পৃথিবীজোড়া এখন ভেজিটেবল ও অর্গানিক খাবারের জয়জয়কার। ওই ক্যাফেতে চমৎকার মাল্টিগ্রেইন নরম চ্যাপটা আকৃতির বনরুটি দিয়ে বানানো ভেজিটেবল স্যান্ডউইচ আমার কাছে দারুন সুস্বাদু লাগলো। বনরুটিতে কোন গ্রেইন বা শস্য নেই! গ্রেইনের মাঝে তিল, তিসি, কালিজিরাতো আছেই, এমন কি মিষ্টি কুমড়ার বিচিও বাদ যায় নি। স্যান্ডউইচে ছিল বেগুন, মিষ্টি কুমড়া, সাদা মিষ্টি আলু, ক্যাপসিকাম আরও কত কি। স্পেনের খাবার বলার মতো না। তবে খাঁটী স্প্যানিস সুগন্ধী জাফরান দিয়ে রাঙ্গানো চিকেন পাইয়েইয়া(Paella) দেখলাম মানুষের খুব পছন্দ। প্যারিসে ঘরের কাছে বলে আমরা দুই বেলা ওই ঝকঝকে তকতকে ছিমছাম ক্যাফেতে খেয়ে নিতাম। রাতের খাবার ঘরে তৈরী হতো। তবে ফরাসী বা বাঙ্গলা খাবার নয়। সোজাসাপটা ইটালিয়ান খাবার পাসতা রেধে সঙ্গে সাদা গোট চিজ, অলিভ, শশা, টমেটো দিয়ে গ্রীক সালাড দিয়ে ডিনার।

প্রথম দিকে ক্যাশিয়ার মহিলা ও তার সহকারী তরুণী মেয়েটি হাসিবিহীন ব্যাজার মুখে অর্ডার নিত, এবং তেমনি গোমড়া মুখে খাবার এনে দিত। ফ্রেঞ্চ একটু জানি তাও ধন্যবাদ বলতেও মুখ খুলতাম না। শেষদিন ব্রেকফাস্টে দেখি বয়ষ্ক মহিলা চাঁদমুখ করে অর্ডার নিল এবং তরুণী সহকারীও হাত নেড়ে চোখে ঝিকমিকি আলো ছড়িয়ে সম্ভাষন জানালো। খাবার দেওয়ার সময়ও মেয়েটি হাসি হাসি মুখে বল্লো 'সিলভুয়্যা প্লে' 'বন এ্যাপেতিত' ।

আমিতো হতভম্ব। আমার বিস্মিত চাউনি দেখে ছেলে বল্লো 'দুই বেলার বাঁধা কাস্টমার দেখে ওদের মুখে হাসি শেষ হচ্ছে না, বুঝলে মামনি' । ভেবে দেখলাম তাইতো। চারজন মানুষের কাছ থেকে ওরা কম ইউরো তো হাতিয়ে নিচ্ছে না। তবে ব্যাজার মুখ হউক আর যাই হোক না কেন ফরাসীদের খাবার দেখতেও ভাল, খেতেও মজা।

ঘুরাঘুরি করতে বের হয়ে দেখা গেল পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বন্ধ। পুলিশ চারদিকে। প্যারিসের নামী দামী শপিং সেন্টার লা ল্যাফাইয়েলের সামনে স্ট্যানগান হাতে সৈনিকরা পাহাড়ায়। কিসের জন্য এতো সতর্কতা! ন্যায়সংগত পেনসন দাবীদাররা কি এতোই ভয়ংকর যে তাদের তাড়ানোর জন্য স্টেনগানধারী দরকার? নাহ্ তা নয় । এটা হচ্ছে 'সন্ত্রাসী' দমনের জন্য।

আগুনে পুড়ে যাওয়া নোটরড্যাম গির্জা তখনও অর্থাৎ ডিসেম্বর ২০১৯শেও দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত হয়নি। বাইরে থেকে ঘুরে ঘুরে দেখলাম, আর ছোটবেলায় পড়া ভিক্টর হুগোর চরিত্র 'হান্চব্যাক অব নোটারড্যাম'কে কল্পনায় খুঁজলাম।

নোটরড্যাম গির্জার পর ল্যুভ আর্ট গ্যালারী হচ্ছে গন্তব্য। হাঁটা হয়েছে অনেকটা। এবার কাছের শপিং মলের ঝলমলে এক ক্যাফেতে কফি আর সুস্বাদু ফ্রেঞ্চ ক্রোসো খাবার ইচ্ছা হল। খাওয়ার শেষে মনে হল প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে তবেই আর্ট গ্যালারীতে যাত্রা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। ওখানেওতো হাঁটতে হবে। সামনেই আসছে ক্রীষ্টমাস তাই শপিংমলের ভিতর আলোর বন্যা বইছে। টয়লেটেও তাই। আলো ঝলমল টয়লেট ব্যবহার করতে হলে এক ইউরো যথেষ্ঠ নয় দিতে

হবে এক ইউরো দশ। সিভিল, মাদ্রিদ, গ্রানাডাতে টয়লেটে যেতে এক ইউরোর বেশী কখনোই দিতে হয়নি। সেভিলে গাড়ীর চালক ঠিকই বলেছিল প্যারিসে সবই দাম।

ল্যুভ গ্যালারিতে যেতে যেতে দেয়ালে লিওনার্দোর চিত্র প্রদর্শনীর পোষ্টার চোখে পড়লো। শুরু হয়েছে অক্টোবরে ২০১৯এ চলবে ফেব্রুয়ারী ২০২০ পর্যন্ত। প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছে দা ভিঞ্চির মৃত্যুর পাঁচশত বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে। এই প্রদর্শনীতে 'মোনালিসা'তো থাকবেই। তবে নিশ্চিত জানি লিওনার্দো দা ভিঞ্চির 'সালভেতর মান্দি'(ল্যাটিন ভাষায় 'সেভিয়র অব দ্যা ওয়ার্ল্ড') শিরোনামের চিত্রকর্মটি এখানে থাকবে না। প্রথমত: দা ভিঞ্চির বিখ্যাত ১৫/২০টি চিত্রকর্মের মধ্যে এই শিল্প কর্মটিই ব্যাক্তি মালিকানায় ছিল ও আছে। দ্বিতীয়ত: নিউনিয়র্কের ক্রিস্টির ২০১৭র মার্চের অকশনে সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রিত হওয়ার পর 'সালভেতর মান্দি'কোথায় আছে তার হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। এ পর্যন্ত যত চিত্রকর্ম পৃথিবীতে বিক্রী হয়েছে তার মধ্যে এটি ছিল সবচেয়ে দামী। এর বিক্রয় মূল্য হল ৪৫০,০০০,০০০ ইউএস ডলার, যা প্রায় অর্ধেক বিলিয়ন ডলার।

এই চিত্রকর্মে দেখা যাচ্ছে রেনেসার পোষাকে আশির্বাদ দেয়ার ভঙ্গিতে এক হাত উত্তোলিত ও অন্য হাতে স্বচ্ছ ক্রিস্টাল বল হাতে যীশু। দীর্ঘদিন প্রায় সবার অজান্তে অন্তরালে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে পড়ে থাকায় পরে অনেক যত্নে সাফাই ও তার আগে পাঁচ জন ভিঞ্চি শিল্পকর্মের বিশেষজ্ঞ একত্রিত হয়ে চিত্রটি আসলেই দা ভিঞ্চির অংকিত কি না সে নীরিক্ষা করেছিলেন। আসল কি নকল সে অন্য বিতর্ক। পূণরুদ্ধার কর্ম সম্পাদন শেষে 'সালভেতর মান্দি'কে ২০১১ সালে লন্ডনে এক প্রদর্শনীতে উপস্থাপন করা হয়।

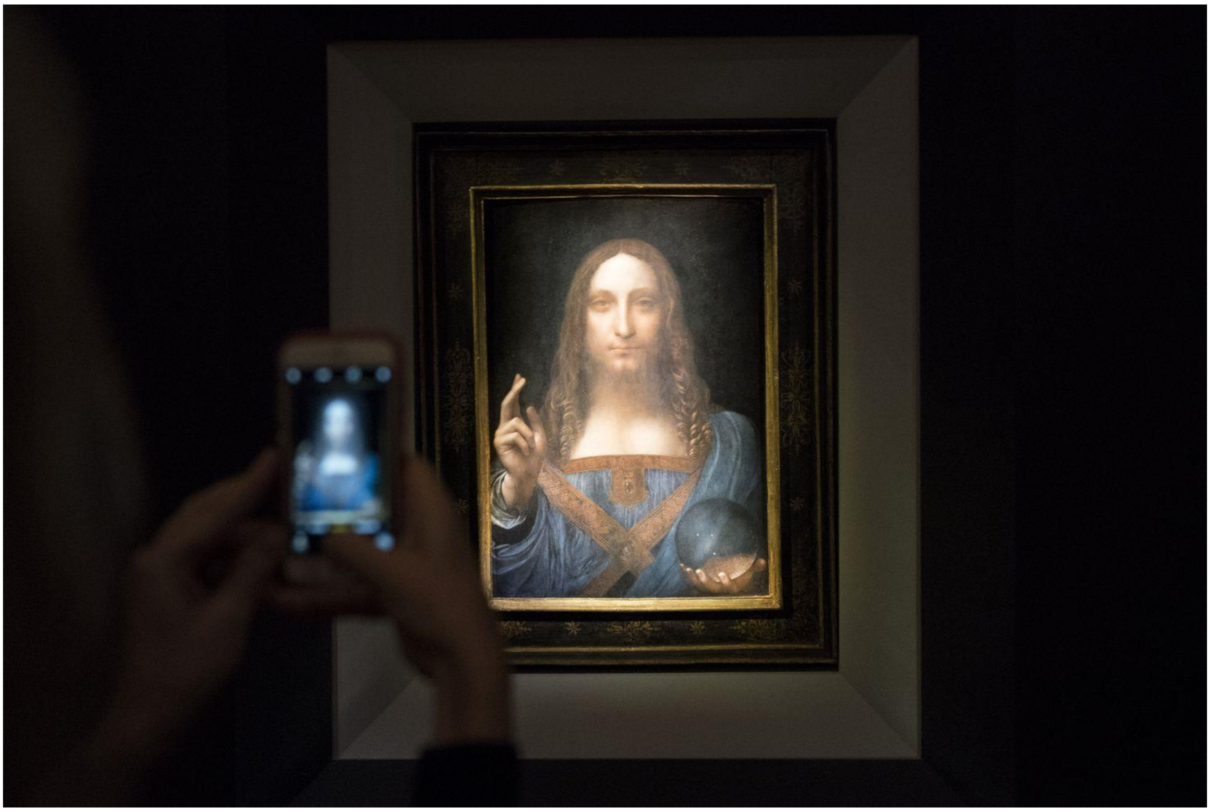

তার আগে পাঁচ জন ভিঞ্চি শিল্পকর্মের বিশেষজ্ঞ একত্রিত হয়ে চিত্রটি আসলেই দা ভিঞ্চির অংকিত কি না সে নীরিক্ষা করেছিলেন। আসল কি নকল সে অন্য বিতর্ক। কথা হল এতো দাম দিয়ে কে শিল্পকর্মটি কিনলো? শোন যায় দুবাইয়ের সাংস্কৃতিক মন্ত্রী ক্রিস্টির অকশনে রেকর্ড মূল্যে এটি কিনেন। আর তা কেনা হয়েছিল দুবাইয়ে ল্যুভ গ্যালারীর জন্য। যা জনমানুষের জন্য প্রদর্শিত হওয়ার কথা। কিন্তু পরে বাতাসে ভেসে বেড়ানো ফিসফিসানীতে শোনা যাচ্ছে এই শিল্প কর্ম

এক সৌদী রাজপুত্র দুবাইয়ের মন্ত্রীর মাধ্যমে আড়ালে থেকে কিনিয়েছেন। রাজপুত্র শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হতেই পারেন তাতে দোষের কিছু নেই। তবে এই রাজপুত্র এর উপযুক্ত কি না কে জানে। সালভেতর মান্দি বিষয়ে ওয়াশিংটন পোষ্টের এক প্রবন্ধে(অক্টোবর ১৫, ২০১৯প্রকাশিত) বলা হয়, যে রাজপুত্র রেকর্ড মূল্যে শিল্পকর্মটি কিনেন তিনিই সেই সময়েই ওয়াশিংটন পোষ্টের কলামিস্ট জামাল খাসোগীকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারই অঙ্গুলি হেলনে তুরস্কে নিজেরই দেশের দূতাবাসে খাসোগীকে হত্যার পর টুকরো টুকরো করে বৈদ্যুতিক চুলার আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। যারা বা যে দেশ পৃথিবীর ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছ থেকে হজের মৌসুমেই বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার আয় বা রোজগার করে তাদের রাজপুত্রের জন্য খুন করানো বা শিল্পকর্ম সংগ্রহে অর্থ জোগান কোন বিষয়ই হতে পারেনা।

বলা হয় এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে দা ভিঞ্চির ও অন্য সব ঐতিহাসিক শিল্পকর্মের উপযুক্ত রক্ষনাবেক্ষণের কায়দাকানুন প্যারিসের ল্যুভ মিউজিয়ামেরই যথাযথ ভাবে জানা। অথচ দেখভালের যোগ্যতা থাকলেও ল্যুভের হাতে ওই চিত্রকর্ম আসেনি। শিল্পকর্ম ‘সালভেতর মান্দি’ নাকি রাজপুত্রের বিলাসবহুল ব্যক্তিগত প্রমোদতরীর সিড়ি সংলগ্ন দেয়ালে ঝুলানো আছে। দা ভিঞ্চির কথা বলতে বলতে পৌঁছে গেলাম ল্যুভের কাছে। সেভিলের লা স্পানার চেয়েও অনেক বড় চত্বর ল্যুভের সামনে।

চত্বরের শেষে যেখানে টিকেট দিয়ে ঢুকতে হয় তার খানিকটা পরে নব্বইয়ের দশকে ল্যুভের সামনে নির্মিত তিনটি স্বচ্ছ পিড়ামিড আকৃতির স্থাপনা। মাঝখানেরটি বড়, দু’পাশে দুটি ছোট। ওই পিড়ামিডের পরে ল্যুভের প্রবেশ পথ। কপাল ভাল বলতে হবে যে মায়নাস টেম্পারেচারের মাঝেও সূর্য দেখা দেওয়াতে পিড়ামিডের স্বচ্ছতা সাদামাটা ক্যামেরায়ও ধরা পড়লো।

এর পরেই দেখা হবে মিউজিয়ামের ভিতরে অপেক্ষমান শত শত বছরের প্রাচীন সব ম্যাজিক। তুলির আঁচড়ে ক্যানভাসে উদ্ভাসিত সে সব ম্যাজিকের গল্প আরেক সময়ে বলা যাবে।